আধুনিক বাংলা গদ্যভাষার সন্ধানে

উৎসর্গ

ফরহাতুন্নেসা ও ফখরুল ইসলাম, আমার আম্মা ও আব্বা
যাঁরা আমাকে রচনা লিখতে শিখিয়েছিলেন

লেখকের নিবেদন

দীর্ঘদিন ধরেই একটি ব্যাপার খোঁচাচ্ছিল—ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্যপুস্তক-প্রকল্পের অধীনে বাংলা গদ্য রচনা শুরু হওয়ার আগ দিয়ে বাংলা সাহিত্যের ভাষার চেহারাটা আসলে কেমন ছিল। এর আগে যখন প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা কাব্য পড়েছি তখন কাব্যগুলোর ভাবসম্পদের দিকেই কেবল চোখ গিয়েছিল বেশি, কাব্যভাষার দিকে ততটা নয়। তবে একটি ধারণা জন্মেছিল, আঠারো শতকের শেষদিকে গিয়ে মধ্যযুগের কাব্যগুলোর ভাষা ক্রমশই সহজ-সরল-নমনীয় হয়ে উঠছিল। এ কারণে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাব্য ছাড়াও আধুনিক যুগের গদ্য অবধি বাংলা সাহিত্যের ভাষার স্বরূপ নিয়ে পড়তে শুরু করি। সেটা ২০২০ সালের পয়লা দিকের কথা।

২০২০ সালের মাঝ দিকে আমার পরম পূজনীয় শিক্ষক অধ্যাপক সনৎকুমার সাহাকে বিশেষ একটি কারণে আমি ফোন করি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ পড়তে পড়তে তাঁর সম্পর্কে জানবার আগ্রহ জন্মেছিল। সে-কারণেই আমার শিক্ষক সনৎকুমার সাহার সাথে ফোনে যোগাযোগ করেছিলাম। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনের অনেক কথাই জানিয়েছিলেন অধ্যাপক সনৎকুমার সাহা। কথার ফাঁকে

প্রকাশিত হয়ে গেল, আমি পড়াশোনা করছি বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক যুগের সাহিত্যভাষার বিকাশ নিয়ে। তিনি পরামর্শ দিলেন, বাংলা সাহিত্যের ভাষা বিষয়ে আমার পর্যবেক্ষণগুলো যেন প্রবন্ধাকারে লিখে ফেলি। তাঁর পরামর্শ আমাকে উৎসাহিত করে। মূল সাহিত্যকর্ম বাদে তিনি কয়েকজন লেখকের সাহিত্যালোচনা পড়তে বললেন। সেসব প্রথিতযশা লেখকদের মাঝে রয়েছেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র সেন, সুকুমার সেন, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, প্রমথনাথ বিশী, আহমদ শরীফ, গোলাম মুরশিদ প্রমুখ। আবারও আমি পড়তে বসে গেলাম।

তারপরে, ২০২০-এর মাঝামাঝি সময় থেকে শুরু করে ২০২৩-এর মাঝ অবধি, আমি বেশ ক'টা প্রবন্ধ রচনা করি। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ ও মধ্যযুগের কাব্যের ভাষা নিয়ে প্রবন্ধগুলো পয়লা ধাপে লেখা হয়। কাব্যগুলোর ভেতরে ছিল *চর্যাপদ* থেকে শুরু করে মধ্যযুগের গুরুত্বপূর্ণ কিছু গ্রন্থ—*শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* থেকে 'পুঁথিসাহিত্য' পর্যন্ত। তারপরে লেখা হয় ১৮০০ সাল থেকে আধুনিক যুগের শুরুর দিকের গদ্যের ভাষা নিয়ে কিছু প্রবন্ধ। আধুনিক যুগের গদ্যভাষার স্বরূপ ধরবার জন্য যেসব প্রথিতযশা লেখকদের সাহিত্যকর্ম অনুসরণ করেছি তাঁরা হলেন রামরাম বসু, উইলিয়াম কেরি, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামমোহন রায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাংলা সাহিত্যের কাব্যভাষা ও গদ্যভাষা নিয়ে যেসব প্রবন্ধ রচনা করি, সেগুলোর কিছু কিছু ২০২১ থেকে ২০২৪ সময়কালে ছাপা হয়েছে 'তর্ক বাংলা', 'উত্তরপর্ব' এবং 'সিল্করুট'-এ। বাংলা সাহিত্যভাষার স্বরূপ সন্ধানে নেমে ১৮০০ সালের শুরু থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখালেখি পর্যন্ত বিভিন্ন গদ্যকর্মের ভাষা নিয়ে যেসব প্রবন্ধ লিখেছিলাম, বর্তমান গ্রন্থে সেগুলো ঠাঁই পেল।

এবার কৃতজ্ঞতা স্বীকারের পালা। বাংলা সাহিত্যভাষা নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে অনুপ্রেরণা ও সাহস জোগানোর জন্য প্রথমেই অধ্যাপক সনৎকুমার সাহাকে শতকোটি প্রণাম জানাই। তিনি এ অভিযাত্রায়

অনুপ্রাণিত না করলে এসব প্রবন্ধ কোনোদিন লেখা হতো না! পত্রপত্রিকায় কিছু প্রবন্ধ প্রকাশ করে ধন্য করেছেন সাখায়াত টিপু, আবু হেনা মোস্তফা এনাম ও শানজিদ অর্ণব। তাঁদের কাছে অনেক ঋণ রইল। এছাড়া, শুভানুধ্যায়ী বন্ধুরা বিভিন্ন সময়ে এসব প্রবন্ধ নিয়ে আলোচনা করেছেন, সুপরামর্শ এবং প্রেরণা দিয়েছেন। এঁদের মাঝে রয়েছেন পরম শ্রদ্ধেয় ওয়াসি আহমেদ, ইমতিয়ার শামীম, মিজানুর রহমান লিখন, আয়শা ঝর্ণা, রেজাউল করিম সুমন, আবু হেনা মোস্তফা এনাম, আফসানা বেগম, রুমা মোদক, গওহর গালিব, সাগুফতা শারমিন তানিয়া, কীযি তাহ্‌নিন, ফারহিদা ইসলাম নীতু, মুহিত হাসান দিগন্ত প্রমুখ। এঁদের সকলের কাছেই আমি যারপরনাই কৃতজ্ঞ। এই সুযোগে জানিয়ে রাখি, পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা করেছেন অধ্যাপক সনৎকুমার সাহা ও আবু হেনা মোস্তফা এনাম। তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা তাই আরও বেড়েছে। তবে বলে রাখতে হয়, বইটিতে যেসব তথ্যগত ভুলভ্রান্তি রয়ে যাবে, যেসব মতামত প্রকাশিত হবে, সেগুলোর দায়ভার একান্তই লেখকের। আমার শত ব্যস্ততা লক্ষ করে বেশ কিছু প্রবন্ধ টাইপ করে দিয়েছেন পরিকল্পনা কমিশনের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা রফিক আহমেদ। তাঁর ঋণ শোধ করার নয়! কথাপ্রকাশের স্বত্বাধিকারী জসিম উদ্দিন সাহেবকে কুর্নিশ জানাই। তাঁর উদ্যোগ ছাড়া এই বই আলোর মুখ সহজে দেখতে পেত বলে মনে করি না। এ সুযোগে আমার স্ত্রী আবিদা সুলতানার প্রতিও নমিত হই। তাঁর নিজের শত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি আমার কাজকে নানানভাবে প্রশ্রয় দিয়েছেন। অনেক ধন্যবাদ তাঁকে।

ফয়জুল ইসলাম
ইস্কাটন, ঢাকা
২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪

সূচি

কথামুখ ১৩
উপক্রমণিকা ২৩
রামরাম বসু: হাঁটতে শেখার সময় ৩৫
উইলিয়াম কেরি: সরল গদ্যভাষার সূচনা ৬২
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার: বাংলা ভাষার প্রথম শক্তিশালী গদ্য ৮৯
রামমোহন রায়: ঋজু হলো বাংলা গদ্যভাষা ১১৮
প্যারীচাঁদ মিত্র: গণমানুষের মুখের ভাষার কাছে ১৫০
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর: বাংলা গদ্যভাষার মুক্তি ১৮৭
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়: আরও ঋজু, আরও সহজ ২৪৫
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: বাংলা গদ্যভাষার হাজার দুয়ারী ২৯৬
আকরগ্রন্থ ৩৫৪
সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ৩৫৬

কথামুখ

তিনি তখন প্রাক-স্নাতক পর্যায়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। নাম, ফয়জুল ইসলাম। মেধাবী বলে আলাদা করে নিজেকে চেনান। বাবা পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের অর্থনীতির নামী অধ্যাপক ফখরুল ইসলাম। আমাদের শ্রদ্ধেয়। ফয়জুল আলাদা করে আর সবার মনে একটি জায়গা করে নেন। তাঁর ডাকনাম সুমন। এইটিরই বেশি চল। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ ছিল যথেষ্ট খোলামেলা। হরেক রকম আকর্ষণ। নেতিবাচক বা উপেক্ষার যোগ্য সেসব নয়। তবে সব দিকে নজর গেলে বিশেষ বিদ্যাশৃঙ্খলা মার খায়, পরীক্ষার ফলেও তার ছাপ পড়ে। এমনটিই ঘটে ফয়জুলের বেলায়। এই ধাক্কাটা বোধহয় তাঁর কাজে লাগে। প্রশাসনিক ধারায় গুরুত্বপূর্ণ সচিবের পদ অলংকৃত করে সম্প্রতি তাঁর ধারাবাহিক অবসরজীবনের শুরু। মোটেই একঘেয়ে নয়। পাশাপাশি উচ্চতর পড়াশোনা, লেখালেখি এসবও চালিয়ে যান। দেশে, বিদেশেও। ফলে আপন কীর্তিতে তাঁর যোগ হয়েছে একাধিক পালক। সবই গৌরবময়। কথাসাহিত্যের অঙ্গনেও। কোনোটিই ফেলনা নয়। আধখেঁচড়াও নয়। আমাদের তৃপ্তি বাড়ে।

এবার ফয়জুল ইসলাম যোগ করেছেন এই বই, *আধুনিক বাংলা গদ্যভাষার সন্ধানে*। রীতিমতো গবেষণামূলক। কিন্তু কোথাও একঘেয়ে

মনে হয় না। স্বেচ্ছাকৃত ফাঁকিবাজিও নেই। ধারাবাহিক সাবলীল। বিষয় ও বিষয়ীর সম্পর্ক-সম্বন্ধ বিচার সর্বতোভাবে নিরাসক্ত ও আতিশয্যহীন। কালের মাত্রা প্রত্যক্ষের সীমা ছাড়ায় না। তথ্যরাশির প্রতিস্থাপন যথাযথ ও নৈর্ব্যক্তিক। তাঁর গদ্য পাঠ আমার কাছে আনন্দের। অশেষ তৃপ্তিরও।

বইয়ের শুরু উনিশ শতকের গোড়ায় দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায়—শ্রীরামপুরের ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে পাশ্চাত্যের কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের স্থানীয় ভাষার মাধ্যমে কথোপকথনে অভ্যস্ত করার উদ্যোগের প্রসঙ্গটি দিয়ে। যার লক্ষ্য ছিল, স্থানীয় গণমানুষের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা। ইংরেজদের পড়ার জন্য বাংলায় কোনো পাঠযোগ্য বই না থাকায় তা তৈরি করে নেওয়ার তাগিদও এর সঙ্গে মেশে। সবটা পরিচালিত হতে থাকে উইলিয়াম কেরি ও জন মার্শম্যানের মতো উদ্যোগী অধিকর্তাদের হাতে। অনিবার্যভাবে প্রয়োজন পড়ে তখন এদেশের পণ্ডিতদের। তাঁরা সাধ্যমতো সহযোগিতা করেন। বাংলা গদ্য এভাবেই নিজের পায়ে দাঁড়াবার একটি ভিত্তি পায়। পণ্ডিতেরা সবাই মেধাবী ছিলেন না অবশ্যই; কিন্তু কাজ চালাবার মতো ভিত একটি তৈরি হয়। ফয়জুল এই পর্বটিকে উদাহরণসমেত মেলে ধরে আমাদের কৌতূহল মিটিয়েছেন। বিশেষ করে যাজক উইলিয়াম কেরি হাটে-মাঠে ঘুরে সাধারণ মানব-মানবীর মুখের ভাষার যে সব নমুনা তাঁর *কথোপকথন* গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন, তার তুলনা মেলা ভার। যে দিক থেকেই দেখি, তাঁর বস্তুনিষ্ঠা বাস্তবের অনাসক্ত প্রতিফলন ঘটায়। সাহিত্য রচনা কেরির লক্ষ্য ছিল না, তবে সৃষ্টিশীল কথাসাহিত্যের বহু উপাদান এতে মেলে। ফয়জুল গদ্যভাষা নির্মাণে তাঁর অবদানের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

রামরাম বসু ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ছিলেন প্রায় একই সময়ে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বেতনভুক পণ্ডিত। তাঁদের ওপরেও বর্তেছিল বাংলা গদ্য নির্মাণের দায়িত্ব। প্রাথমিকভাবে তাঁদের কাছে গদ্য ছিল কেরির নির্দেশনায় পাঠ রচনার বিষয়। দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে এর কোনো যোগ ছিল না। তবু ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বসে নিজেদের

দায়িত্ব পালনের তাগিদে তাঁরা গদ্য রচনায় হাত দেন। রামরাম বসু রচনা করেন *রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র* (১৮০১), তারপর *লিপিমালা* (১৮০২)। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার লেখেন *বত্রিশ সিংহাসন* (১৮০২), *হিতোপদেশ* (১৮০৮), *রাজাবলী* (১৮০৮), *বেদান্তচন্দ্রিকা* (১৮০৮) ও *প্রবোধচন্দ্রিকা* (১৮২৩)। তাঁদের রচনায় আরবি-ফারসি ভাষার শব্দাবলি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ওই যুগসন্ধিকালে এমনটি অস্বাভাবিক নয়। জমি নিয়ে মামলা-মোকদ্দমায় প্রাক-ব্রিটিশ কর্তৃত্বের প্রকাশ ঘটত ফারসিতে অথবা আরবি-ফারসির মিশ্রণে। অন্য কোনো মুক্ত আলোচনা যেখানে প্রায় অবান্তর, এবং শিক্ষার মানদণ্ড বিচারে সংস্কৃত টোল অথবা আরবি-নির্ভর মক্তব প্রয়োজনানুসারে কার্যকর—সেখানে প্রাথমিক বুলিতে তাদের উপস্থিতি মোটেই অসংগত নয়। ঐতিহ্যের ও অভিজ্ঞতার পশ্চাৎপটে তারা থেকে যায়। সাক্ষরতার হার যেখানে শূন্যাভিমুখী, সেখানে এমনটি কোনো বিস্ময় জাগায় না। সাহিত্যের বিকাশ যে তখন ঘটে না, তা নয়। তবে তা পদ্যে। নবম শতক থেকে দ্বাদশ শতকের ভেতর *চর্যাপদ*, তারপর *কৃত্তিবাসী রামায়ণ* ও কাশীরাম দাসের *মহাভারত*-এর দেখা মেলে। *বৈষ্ণব পদাবলী*র কথা ফয়জুলও বলেছেন। নিছক ভক্তিভরে নয়, সাহিত্যকর্ম হিসেবে এখনো অনেকে এসব পড়েন। আলাওলের *পদ্মাবতী*, দৌলত উজির বাহরাম খানের *লায়লী মজনু* কি শাহ মুহম্মদ সগীরের *ইউসুফ-জুলেখা* আজও পাঠ করলে রোমাঞ্চ জাগে। পূর্ববঙ্গ গীতিকা ও কবিগানও কম উল্লেখযোগ্য নয়।

এই যে গদ্যভাষা গড়ে ওঠে না, কিন্তু পদ্যনির্ভর কথা ও কাহিনি যুগ যুগ ধরে পুনরাবৃত্ত হতে থাকে—তার একটি কারণ সম্ভবত কর্মকলায় পরিবর্তনহীনতা। নদী-বিধৌত বাংলার উর্বর পলিভূমি জনগণকে বিপুল মাত্রায় কৃষিনির্ভর করে রাখে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার তখনো কোনো উদ্বেগের কারণ হয় না। তাই বহুমুখী উদ্যোগে চেতনাকে প্রসারিত করার প্রয়োজন ভেতর থেকে গড়ে ওঠেনি। তেমনটি হলে গদ্যের চাহিদা গজায় না। অভিজ্ঞতার আবর্তন একই

ছকে বাঁধা থাকে। 'কে মালিক, কে সে রাজা'—এই নিয়ে গণমানুষের কৌতূহল থাকলেও প্রাত্যহিক জীবনচর্চায় তার ছাপ খুব কমই পড়ে। আজ অনেকের কাছে অদ্ভুত মনে হতে পারে—১৭৫৭-য় পলাশির প্রান্তরে যখন রাজ্য ভাঙা-গড়া নিয়ে জীবন-মরণ যুদ্ধ চলছে, তখন তার পাশের মাঠে কৃষক নিশ্চিন্তে হাল-চাষ নিয়ে ব্যস্ত। জীবনমুখী কর্মকাণ্ডের যৌক্তিক অনুশীলনে প্রশ্ন-মীমাংসা কি তর্ক-বিতর্ক উৎসাহ না পেলে গদ্য কোনো বাস্তব তাগিদ ভেতর থেকে পায় না। এ ছাড়াও যুদ্ধ-বিগ্রহ, জয়-পরাজয়—এসবের বিষয়-বর্ণনাও গদ্যমুখী সাহিত্য গড়ে তুলতে পারে, যদিও পদ্যের অগ্রাধিকার মেনে নিয়ে। অতীতের বাংলায় তেমন কোনো প্রয়াসের কথা জানি না। বাংলা গদ্যভাষার যাত্রা শুরুর সময়বিন্দু হিসেবে সাধারণভাবে স্বীকৃত উনিশ শতকের প্রথম কয়েক বছর। যুগাবসান ও যুগারম্ভের ক্রান্তিপর্বে তাৎক্ষণিকভাবে বহিরাগত ধ্যান-ধারণার প্রচার ও প্রশাসনের চাহিদা মেটানোই ছিল তার মূল লক্ষ্য। বাংলা গদ্যের সক্ষমতা বাড়ানো এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। পরে অবশ্য এই সক্ষমতা বাড়ানোই অগ্রাধিকার পায়। বলা যায়, বাংলা ভাষা তখন সাবালক।

ফয়জুল জানাচ্ছেন, রামরাম বসুর *লিপিমালা* কম আরবি-ফারসিঘন; কম আড়ষ্ট। এই বইতে তাঁর দেওয়া নমুনা থেকেও তা অনুমান করা যায়। আমাদের কৌতূহল মেটে। তবে বাংলা গদ্যের স্বায়ত্তশাসিত অধিকার তাতে ফোটে না। নৈরাজ্যের ছাপ তাতে থেকে যায়। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ছিলেন সংস্কৃত ঘরানার পণ্ডিত। বাংলা গদ্য গড়ে ওঠার প্রাথমিক পর্বে উইলিয়াম কেরি ও রামরাম বসুর সঙ্গে একই প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্যে প্রকাশিত হয় তাঁর *বত্রিশ সিংহাসন*সহ অপরাপর গ্রন্থ। আজকের প্রেক্ষিতে তাঁর গদ্যকে অনেকটা অতীতাশ্রয়ী বলতে হয়। সংস্কৃত গদ্যে অন্বয়সূত্র শব্দে ও বাক্যে যথার্থ ভারসাম্যের অনুসরণ করে। সেদিকে দৃষ্টি না দিয়ে যান্ত্রিকভাবে তার অনুসরণ বাংলা গদ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে না। আমরা অবশ্য তাঁর প্রয়াসকে উপেক্ষা করতে পারি না।